নীলসাগরের নীলকণ্ঠ চরিতকথা

অনাদিরঞ্জন ঝিাস

ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বারো শ'কিলোমিটার দূরে, বঙ্গোপসাগরের বুকে এখানে ওখানে মাথা চাড়া দেয়া ন্যূনা ধিক ৫৭২টি দ্বীপ এবং পাথরখণ্ডের সমাহারে গঠিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ--- যার দক্ষিণতম বিন্দু 'ইন্দিরা পয়েন্ট' (পূর্বনাম--- পিগমিলিয়ম পয়েন্ট)-ই ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্ত বলে পরিচিত। এই দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রফল ৮,২৪৯ বর্গকিলোমিটার। সংখ্যায় ৫৭২টি হলেও, মাত্র ৩০-৩২ টি দ্বীপেই আছে জনবসতি। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এ অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৩,৫৬,২৬৫ জন (আন্তঃকালিক)। তদনুযায়ী লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিট ারে ৪৩ জন। এই সুবিস্তৃত দ্বীপপুঞ্জের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ চিরহরিৎ অরণ্য দিয়ে ঢাকা। বছরের আটমাসব্যাপী এখানে বৃষ্টি হয়। বাকি চার মাস গরম ; শীত এখানে নেই বললেই চলে। ভাষাগত দিক দিয়ে আন্দামানও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ২৩ শতাংশ (এখন সম্ভবত আরো কম ; ২০ শতাংশ এর আশেপাশে) মানুষ 'বঙ্গজ'। ('বাঙালি'র পরিবর্তে 'বঙ্গজ' শব্দটি প্রয়োগের কারণ পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে পরিস্ফুটিত।)

নামে 'আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ' হলেও, প্রশাসনিক দিক দিয়ে 'নিকোবর দ্বীপসমূহ'কে 'উপজাতি - অধ্যুষিত'অঞ্চল বলে দেয়া হয়েছে একটা আলাদা সত্তা--যার ফলে নিকোবর অন্তর্ভুক্ত দ্বীপগুলিতে যাওয়া - আসায় আরোপিত হয়েছে ন ানারকমের বিধিনিষেধ। একমাত্র এতদঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা, সরকারি কর্মচারী 'পাশ' ধারী কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো যাওয়ার অনুমতি নেই 'উপজাতি-অধ্যুষিত' নিকোবর দ্বীপসমূহে। এ ছাড়াও ভৌগোলিক ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে অ ান্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আরো পার্থক্য আছে, আর তা হল-- এতদঞ্চলের আদিবাসীদের (TRIBES) শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা। দ্বীপপুঞ্জের আদিম আদিবাসীদের যে দু'টি শ্রেণী (RACE) বর্তমান-- তা হল নেগ্রিটো এবং মঙ্গোলীয়ান। আন্দামানের কয়েকটি দ্বীপে যে আদিবাসী / উপজাতিগুলির বাস--তারা হল জারে য়া, ওঙ্গি, গ্রেট আন্দামানিজ / সেন্টিনেলিজ (নেগ্রিটো)। আর, নিকোবর অঞ্চলে যে উপজাতিগুলি বসবাস করে, তারা হল নিকোবরী (ছোলচু) এবং শম্পেন (মঙ্গোলীয়ান)। সভ্যতার মূল স্রোতেমোটামুটিভাবে মিশে গেছে নিকোবরী (ছে ালচুদের) জীবনচর্যা। বাকি উপজাতিগুলি এখনও বনবাসী। জারোয়ারা তো হিংসা ত্যাগ করলো এই সেদিন (অক্টোবর, ১৯৯৮) ! এ সমস্ত কারণে, নামে 'আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ' হলেও বর্তমান কথানির্মাণে উহ্য থাকবে নিকোবর দ্বীপগুলির বর্ণনা / অবস্থান। আশা কবি সহৃদয় পাঠক তারজন্য নিরাশ হবেন না। সবচেয়ে বড় কথা-- নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাঙালির কোনও বসতি বা উপনিবেশ নেই।

১৯৫৯ সালের আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলের অঞ্চলের অধিবাসী বলতে ছিল এই আদিবাসী / উপজাতির সদস্যরা এবং ব্রিটিশ কর্তৃক সেলুলার জেলে নিয়ে আসা বেশ কিছু কয়েদি (কয়েদি, অর্থাৎ কনভিক্ট, স্বাধীনতা-সংগ্রামী অবশ্যই নন) ও ব্রিটিশ সরকারের কিছু রাজকর্মচারী (ভারতীয়) এবং তাদের বংশধরগণ। শেষোক্ত পর্যায়ের মানুষগুলি এখনএখানে 'লে াকাল-প্রাক্‌বিয়াল্লিশ' (LOCAL PER - 42) অভিধায় পরিচিত।

স্বাধীনতা - সংগ্রামের সমুদ্রমন্থনে উত্থিত 'অমৃতকুম্ভ' যদি হয় ইংরেজদের ভারতত্যাগ ('স্বাধীনতালাভ' শব্দটির অপপ্রয়োগ করছি না।), তাহলে তার 'বিষকুম্ভ' হল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতবর্ষের তিনটুকরো হওয়া। যে হলাহল পান করে 'নীলকণ্ঠ' হয়েছিল বাঙালি জাতির এক বৃহত্তর অংশ। শুধু বাঙালি কেন ! নির্দ্বিধায় লিপিবদ্ধ করি--ভারতবর্ষকে ব্রিটিশমুক্ত করতে যে দুটি রাজ্যের মানুষ দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি আত্মাহুতি--- বেছে বেছে 'দেশ ভাগের' মোক্ষম কোপ পড়ল সেই বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর। দু'টি জাতির কোমর সুনিপুণভাবে ভাঙা হল বেশ চত্রান্ত করেই, যার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের দেশের তৎকালীন কর্ণধারগণ, মায় 'জাতির পিতা'ও ! বাঙালি জাতির 'ইহুদীত্ব গ্রহণ' সেই সময় থেকেই আর 'সেই ট্রাডিশন এখনও সমানে চলেছে।'

সাধারণভাবে আমরা বুঝে থাকি---বাংলা যার মাতৃভাষা, তিনিই বাঙালি। এ অর্থে, বর্তমান স্বাধীন ও সার্বভৌমিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকেও বাঙালি বলা চলে। কিন্তু, বিপদ ওৎ পেতে আছে সেখানেও। বেশ ক'বছর আগে কোনও একটি প্রতিবেদনে পড়েছিলাম (সম্ভবত 'বঙ্গবার্তা' পত্রিকায়) বাংলাদেশের তৎকালীন মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমানকে কোনও এক প্রকর্তা 'বাঙালি' অভিধায় আখ্যা দেওয়ায় চটেমটে রহমানজী প্রকর্তাকে বলেছিলেন---তাঁকে যেন 'বাঙালি' বিশেষণে ভূষিত না করা হয়, কারণ তনি 'প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী'। মন্ত্রীরা তো জনগণের প্রতিনিধি ! কে জানে বাংলাদেশের জনগণও এই একই মত পোষণ করেন কিনা ! এ প্রবন্ধে অবশ্য আমরা এসব কূটকচালিতে যাবো না। আমরা ধরে নেবো---ভাষাগত দিক দিয়ে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মানুষ* যে যেখানেই থাকেন----তিনিই বাঙালি !

ফিরে আসা যাক আন্দামানে। আন্দামানে বাঙালি, বসতিনির্মাণের উদ্দেশ্যে, যূথবদ্ধ হয়ে প্রথম পা রাখে ১৯৪৯ সালে। দেশ 'স্বাধীন' হওয়ার মাশুল দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা 'বাংলাদেশ' বাঙালি যতটা আত্মত্যাগ করেছে, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, স্বাধীনতা- প্রাপ্তির মূল্য সেই পরিমাণে দিতে হয়নি পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিকে। চোদ্দপুষের ভিটেমাটি রাতারাতি যাদের কাছে হয়ে গেছিলো বিদেশ, ধন - সম্পদ ফেলে শুধু মান-প্রাণ আর নারীর সম্ভ্রম বঁাচতে সেই পূর্ব পাকিস্তানের এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বাঙালিকে তখন পাড়ি দিতে হয়েছিলো ভারতবর্ষের দিকে। কুপার্স, ধুবুলিয়া, মানা হয়ে কালক্রমে তাদের পুনর্বসতি হয়েছে দণ্ডকারণ্যে, বাস্তরে, মালকানগিরিতে, নৈনিতালে এবং এই আন্দামানে!

আন্দামানে বাঙালির 'অভিপ্রয়াণ'টাও সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত নয়। দেশভাগের গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল আন্দামানে উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের বিরোধিতায় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গীয় বামপন্থী নেতাদের তথাকথিত 'উনকিলাব'---যা এখন আরেকটি 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে চিহ্নিত হচ্ছে। ভারত তথা তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তান-আগত উদ্বাস্তুদের যখন জাহাজে করে পাঠানো হচ্ছিলো এই আন্দামানে, তখন এই ঐতিহাসিক ভুল করা দলের দায়িত্বশীল নেতারা বাদ সাধেন সেই মহৎ 'চত্রান্তে'! ভুল বুঝিয়ে, ভয় দেখিয়ে, স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাঁরা উদ্বাস্তুদের সিংহভাগকে নিরস্ত করেন আন্দামান যাওয়া থেকে। আফশোস হয়--অন্তত এই 'ঐতিহাসিক ভুল'টি যদি তাঁরা না করতেন, তাহলে আজ এই আন্দামান হতে পারতো আর একটি বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল ! তা যে হয়নি--- সে দুর্ভাগ্য এবং দায় যৌথভাবে বাঙালিদেরই।
তবুও, তৎকালীন বামপন্থীদের এই কানভাঙানিকে উপেক্ষা করে, যে কটি পরিবার আন্দামানে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, আজ তাঁরা প্রায় সকলেই আর কিছু না হোক, অন্তত আর্থিক দিক দিয়ে সুখে আছেন। তাঁরা পেয়েছিলেন ধানজমি বসতবাড়ি, নারকেল-সুপারির বাগান করার জমি। বাঁজা মাটির বুকে সোনা ফলিয়ে তাঁরা এখন উচচশির। তাঁদের দ্বিতীয়/ তৃতীয় প্রজন্ম আজ যথেষ্ট 'শিক্ষিত'। সেই শিক্ষা, যা আর্থিক সুরক্ষা দিতে পারে। তাঁদের অনেকেই আন্দামান ও নিকোবর প্রশাসনের অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন বা এখনও করছেন। এঁদের মধ্যে ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, জননেতা / নেত্রী তো আছেনই। অথচ, এঁদের পূর্বপুষদের 'কাউন্টার পার্ট' যাঁরা বামপন্থীদের উস্কানিতে আসেন নি

আন্দামানে--- তাঁদের বংশধরদের অনেকেই আজও মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু তৈরি করতে পারেন নি মূল ভূখণ্ডের কোনও প্রান্তে!

।।দুই ।।

পুনর্বসতিপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু (স্থানীয় ভাষায় যাঁদের বলা হয় 'সেট্‌লার') ছাড়াও, আন্দামানে আরো দু'পর্যায়ের বাঙালির আগমন ঘটেছে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রোত্তর দিনগুলিতে। উদ্বাস্তু বাঙালিদের প্রাথমিকভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রকল্প রূপায়নের জন্য, তাঁদের ওপড়ানো সংসার-শিকড়কে নতুন মাটির গভীরে বিস্তার করার জন্য--এখানে নিযুক্ত করা হয়েছিলো যেসব সরকারি কর্মচারীকে, তাঁদেরও অধিকাংশ ছিলেন বাঙালি। অন্যান্য ভাষাভাষীর শিক্ষকদের পাশাপাশি, বাংলা ভাষায় ও মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মুখ্যভূমি (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে আমদানি করা হয়েছিল বাঙালি শিক্ষকদের। পরবর্তীকালে এসেছেন সেট্‌লারদের কিছু আত্মীয় স্বজন-পরিবার, কিছু ভাগ্য-অন্বেষণে আসা বাঙালি, কিছু ব্যবসাসূত্রে আসা বাঙালি। এই পরের পর্যায়ে আসা বাঙালিরা অবশ্য 'সেট্‌লার'দের ভাষায় 'উইদাউট'। বাংলায় এই 'উইদাউট'কে কি বলা হয় জানা নেই। এছাড়াও, স্বল্প মেয়াদে হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয়ে বদলি হয়ে এসেছেন অনেক বাঙালি কর্মচারী। বিশেষ করে ডাক ও তার বিভাগ, স্টেট ব্যাঙ্ক, কাস্টম্‌স অফিস, ইনকাম টাক্স অফিস, সেন্ট্রাল একসাইজ অফিস, জীবনবীমা ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট মুখ্য কার্যালয় গুলি পশ্চিমবঙ্গ'র অধীনে থাকার সুবাদে, এসব অফিসগুলোতে একসময় বাঙালির প্রাধান্য চোখে পড়তো---এখন যা ক্রমহ্রাসমান, বিশেষ করে ডাক ও তার বিভাগে।

যাটের দশকরে শেষ পর্যন্ত আন্দামানের জনসংখ্যায় বাঙালিদের স্পষ্ট সংখ্যাধিক্য ছিলো। তখন পরিসংখ্যানের তোয়াক্কা না করেই বলা যেতো---আন্দামান বাঙালিপ্রাধান অঞ্চল। কিন্তু এই অহমিকার মুখে ছাই দিয়ে সত্তর দশকের শু থেকে আন্দামানের বুকে আছড়ে পড়ে, বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের মতোই---তামিল জনস্রোত, যা এই ২০০৩ সালেও, সমানভাবে প্রবহমান। অবস্থা এখন এই যে, কোলকাতার জাহাজে করে যদি আন্দামানে নামে ৫৩৫ জন যাত্রী তো চেন্নাইয়ের জাহাজ পোর্টব্লেয়ারের বন্দরে এসে উগ্‌রে দেয় ১২৩৫ জন যাত্রী ---যাদের সিংহভাগই ভাগ্য অন্বেষণে আসা তামিল যুবক। তারা আসে একখানা গামছা এবং একটা ভাঙা টিনের তোরঙ্গ সম্বল করে, আর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শুধুমাত্র ভাষার সমতায় স্থানীয় তামিলদের সহযোগিতা পেয়ে তারা হয়ে পড়ে আন্দামানের 'স্থানীয় বাসিন্দা'! অপরপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে দু'চারজন মুষ্টিমেয় বাঙালি যুবক আসে এখানে--- চাকরিবাকরি / কাজকর্মের খোঁজে, দু'মাস যেতে না যেতেই তারা হয়ে পড়ে গৃহকাতর। 'এখানে শরীর টেঁকে না' এই দোহাই পেড়ে তারা ফিরতি জাহাজে প্যাভিলিয়নের পথ ধরে। আর বাঙালি যুবকদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াবে, তেমন বাঙালি কোথায় আন্দামানে ? আমরা সকলেই তো 'কাঁকড়া' বৃত্তির অধিকারী।

এই যে আসা- যাওয়ার ধারা, এই যে কোলকাতা-আগত এবং চেন্নাই - আগত জাহাজগুলির পেট থেকে যাত্রী প্রসবের প্রতিযোগিতা----এর প্রভাবে আন্দামানের জনসংখ্যার শীর্ষে আছে এখন তামিল ভাষাভাষীরা, তা পরিসংখ্যান যা -ই বলুক! সারা ভারতবর্ষ বন্ধের ডাক দিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল পারেনি পোর্টব্লেয়ার শহরকে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করতে ; অথচ শুধুমাত্র ভাষার দোহাই পেড়ে এই 'তামিল'রাই পেরেছে পোর্টব্লেয়ার শহরের জীবনযাত্রাকে পুরোপুরিভাবে স্তব্ধ করে দিতে। তাও একবার নয় ; দু'দুবার। এতে কী প্রমাণিত হয়? উত্তরটা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য, এর সঙ্গত কারণও আছে. পোর্টব্লেয়ার শহরের সম্পূর্ণ বাজার, ব্যবসা, দোকানপাট তো তামিলদেরই আয়ত্তাধীন। শতকরা দেড়জন বাঙালি ব্যবসাদার কী নিয়ন্ত্রণ করবে পোর্টব্লেয়ার শহরের ?

আন্দামানে উদ্বাস্তু- পুনর্বাসনের পরবর্তী কাল থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি অবধি বাঙালিদের পাশাপাশি 'শিক্ষকতা' করতে আন্দামানে এসেছিলেন 'হিন্দী বলয়' ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক ভাষার মানুষ। যার ফলে, আজ আন্দামানে পাওয়া যায় না--- এমন ভারতীয় প্রধান ভাষাভাষী মানুষ খুব কমই আছেন। আর এই একটি কারণেই আন্দামানের নাম হয়েছে 'মিনি ইন্ডিয়া' (দ্রষ্টব্য 'দেশ' ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৯ সংখ্যা, পৃ ৭) পোর্টব্লেয়ার শহরে যে সব ভাষাভাষী মানুষ

প্রতিষ্ঠানভবন বানিয়ে তাঁদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার কাজে ব্রতী---তাদের মধ্যে আছে অন্ধ্র অ্যাসোসিয়েশন (তেলগু ভাষা), তামিলার সঙ্গম (তামিল ভাষা, কেরালা সমাজম্ (মালয়ালম ভাষা) কন্নড় সংঘ (কন্নড় ভাষা), মহারাষ্ট্র মণ্ডল (ম ারাঠী ভাষা), হিন্দি সাহিত্য কলার পরিষদ (হিন্দি ভাষা) প্রমুখ। বাঙালি প্রতিষ্ঠান আছে বটে একটি (অতুল স্মৃতি সমিতি), তবে তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বাদে সব কিছু হয়। বরং, বাংলা ভাষার অন্যান্য ছোট ছোট কিছু প্রতিষ্ঠান, যেমন--আদিত্য নাট্য অ্যাকাদেমি (বাংলা নাটক চর্চার কেন্দ্র), সুরূপাঞ্জলি (বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র) প্রমুখ বেশ উল্লেখযোগ্য কাজ করছে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির ধারাকে জীবিত রাখার জন্য। এছাড়াও আকাশবাণী পোর্টব্লেয়ারের বাংলা বিভাগের কিছু অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষীণ ধারাটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুদিন হল ত াতেও থাবা বসিয়েছে হিন্দি। সপ্তাহের একদিন, ররিবার দুপুর দুটো বেজে একুশ মিনিট থেকে তিনটে কুড়ি পর্যন্ত 'বাংল া'র জন্য রাখা ছিলো একটা বিশাল 'স্লট'---দীর্ঘ ৫৯ মিনিটের, যেটা এখন কমে গিয়ে হয়েছে মাত্র কুড়ি মিনিটের। তাতে কী হয়েছে ? কোনও বঙ্গ সন্তান এর প্রতিবাদে নিজেদের ঘুম নষ্ট করেনি---আমাদের উদারতা এমনই বিশাল এবং ব্যাপক ! নিজস্ব 'ভবন' নেই অথচ ভাষাচর্চার প্রতিষ্ঠান আছে, এরকম সংস্থার সংখ্যাও কম নেই পোর্টব্লেয়ারে। আচে বিহার স াংস্কৃতিক পরিষদ, উত্তরপ্রদেশ সমাজ, মধ্যপ্রদেশ সংস্কৃতি মণ্ডল, উৎকল সমাজ, রাঁচি অ্যাসোসিয়েশন---এবং আরো কত ছোট বড় প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় নিমগ্ন, একমাত্র 'বাঙালি' ছাড়া। এখানকার বাঙালিদের কাছে 'সংস্কৃতি এবং ভাষা'শব্দবন্ধটিই বুঝি অপাংক্তের।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষাভাষীর এই যে বিবরণ এখানে দেয়া হল---এদের সাংস্কৃতিক গতিবিধি মুখ্যত পোর্টব্লেয়ার শহরকেন্দ্রিক। স্বভাবতই রাজধানীর সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসেবে 'বাংলা' কোনওদিনও তার প্রাধান্য বিস্তার করতে প ারনি। সে জায়গা, সঙ্গতকারণেই দখল করেছে হিন্দি। তার ফলে সমস্ত দ্বীপেই ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দিরচলন, এমনকি বাঙা লিপ্রধান দ্বীপাঞ্চলগুলিতেও।

।। তিন ।।

আন্দামান দ্বীপসমূহর প্রধান যে ছ'টি ভূখণ্ড বর্তমান, সেগুলি হল---উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান, ছে াট (লিট্ল) আন্দামান, নীলদ্বীপ এবং হ্যাভলক দ্বীপ। উত্তর আন্দামানের মুখ্য কেন্দ্র হল ডিগলিপুর এবং মায়াবন্দর। মধ্য আন্দামানের বিল্লিগ্রাউন্ড, নিম্বুডেরা, রঙ্গত, বকুলতলা, কদমতলা এবং উত্তরা। দক্ষিণ আন্দামানে অবস্থিত রাজধানী শহর পোর্টব্লেয়ার এবং তৎসংলগ্ন প্রধান জনপদগুলি হল---বারাটাঙ, জিরকাটাঙ, ফরার গঞ্জ, উইম্বার্লিগঞ্জ, বাম্বফ্ল্যাট, মিঠাখ াড়ি, তির, হারবার্টাবাদ, কলিনপুর, মানপুর, তুষনাবাদ, ছোলদরি, গুপ্তপাড়া, লোহাবাড়ি, ওয়ান্ডুর, বার্মানালা, কা লিকট, চিড়িয়াটাপু। ছোট (লিট্ল) আন্দামানের জনপদগুলির মধ্যে হাট বে, নেতাজীনগর (১১ কিমি), রামকৃষ্ণপুর (১৬ কিমি), বিবেকানন্দপুর (২২ কিমি) এবং ২৮ কিমি অঞ্চল মুখ্য চিহিত। নীলদ্বীপ ৫টি মাত্র গ্রাম সমন্বয়ে এবং হ্যাভলকও সমসংখ্যক বা তার দু'একটি বেশি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

এই যে অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ করা হল---এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত বাঙালিপ্রধান বলে চিহিত, ডিলিপুরের---কালীপুর, শিবপুর, রামকৃষ্ণগ্রাম, সুভাষগ্রাম, মধুপুর, রক্ষ্মীপুর, মিলনগ্রাম, স্বরাজগ্রাম, রাধানগর, শ্যামনগর, ক্ষুদিরামপুর, কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রপল্লী, সীতানগর, নবগ্রাম, রামনগর, জগন্নাথডেরা, নিশ্চিন্তপুর, কিশোরীনগর, পরাণঘাটা, তালবাগান, পশ্চিমসাগর, মোহনপুর, হরিনগর প্রমুখ জনপদগুলি ; মায়াবন্দরের টুগাপুর ; মধ্য আন্দামানের প্রায় সমস্ত জনপদগুলি ; দক্ষিণ আন্দামানের ছোলদারি, মানপুর, কলিনপুর, তির, গুপ্তপাড়া, ওয়ান্ডুর, লোহবাড়ি প্রমুখ; ছোট (লিট্ল) আন্দাম ানের একমাত্র হাট বে ছাড়া সমস্ত জনপদ এবং নীল ও হ্যাভলক দ্বীপ। এইসব অঞ্চলে বসবাস করছে তৎকালীন পূর্ব পা কিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)-এর খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার বাঙালিরা--যাঁদের শতকরা নববই (ব া তারও বেশি) জনই নমঃশূদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, মালো, রাজবংশী প্রমুখ সম্প্রদায়ের মানুষ। (একথা বলা হয়তো খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে কোনও অজ্ঞাত কারণে এঁরা তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্ত নন, যদিও এঁদের পশ্চিমবঙ্গীয় 'কাউন্টারপ ার্ট'রা সকলেই তাই অবশ্য এ ব্যাপারে, এই মানুষগুলির অধিকাংশরই কোনও মাথাব্যাথা নেই ; যেমন নেই ভাষা

সংরক্ষণের ব্যাপারে।) ঢাকা, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ইত্যাদি জেলার মানুষ যে এই 'সেট্‌লার'দের মধ্যে নেই তা নয়--- তবে তা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। শোনা যায় আন্দামানে খুলনা ও ফরিদপুর জেলার 'সেট্‌লার' সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বরিশাল-আগত সেট্‌লারদের সংখ্যাধিক্য। ফলে, 'বাংলা ভাষা' বলতে আন্দামানের 'সেট্‌লার'দের ('সেট্‌লার' মানেই কিন্তু এখানে 'বাঙালি') যেটি প্রচলিত, তা খানিকটা খুলনা-ফরিদপুর - বরিশাল জেলায় প্রচলিত ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটি খিচুড়িবুলি (DIALECT)। ফলে, যে সব অবঙ্গভাষী মানুষগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির পাশাপাশি বাস করে বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছেন---তাঁরাও 'বাংলা ভাষা' হিসেবে রপ্ত করেছেন এই খিচুড়ি ডায়ালেক্ট। আমার চেয়ে বয়সে ছোট একজন তামিল বন্ধু (শিক্ষক) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন--- "তুমি অফিসের থন্‌ বাইরাইয়া কোনহানে যাবো ?" (তুমি অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে?)।

আপন ভিটে থেকে উৎখাত হয়ে, স্রোতে ভাসা শ্যাওলার মতো যেসব উদ্বাস্তু বাঙালি আজ আন্দামানের সেট্‌লার---তাদের বাঙালিয়ানার চাঁদে আজ গ্রহণ লেগেছে। রাজভাষা- রাহু 'হিন্দি' আজ সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে 'বাংলা'কে।নামে মাত্র ত্রিভাষিক শিক্ষাপদ্ধতি (অর্থাৎ বাঙালি প্রধান অঞ্চলে বাংলা - মাধ্যম স্কুল বা বাংলাভাষার পাঠ্যপুস্তক) থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগ হচ্ছে না। এছাড়াও প্রশাসনিক নীতিও এখন বাংলা ভাষা শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালিপ্রধান-ই হোক আর যাই হোক, আন্দামানের কোনও অঞ্চলেই এখন ইংলিশ মিডিয়াম ছাড়া 'মিডল স্কুল' খোলা হচ্ছে না। শ্যামনগরের (ডিগলিপুর, উত্তর আন্দামান) মতো একটি প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৫০/৬০ জন ছাত্র পড়ে--- যারা সকলেই বাঙালি, এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিচ্ছে বাংলা মাধ্যমে। অথচ শ্যামনগরে একটা 'মিড্‌ল স্কুল' খোলা হয়েছে ইংলিশ মিডিয়ামের---যেখানে ছাত্র তো দূর থাক, মাছিও বসে না। তাছাড়া, বাংলা মাধ্যমে যে সব ছাত্রছাত্রী পড়ছে, বিশেষত নিচের শ্রেণীগুলিতে ---তারা যে পাঠ্যপুস্তক পড়ে (বাংলা ভাষায় লেখা) তা প্রকৃত বাংলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে কতখানি প্রামাণ্য---সে বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। কেন প্রয়োজন আছে, একটিমাত্র তথ্য দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। পোর্টব্লেয়ারের কলেজটি একসময় নাকি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিলো। হাত -বদল হতে হতে তা এখন আছে পণ্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এই কলেজে বহুকাল ধরে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 'বাংলা ভাষা'য়ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালে, প্রথমবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে পোর্টব্লেয়ার কলেজের এই বাংলা বিভাগে। আন্দামান 'বাঙালিপ্রধান' অঞ্চল (প্রচলিত 'মিথ' অনুযায়ী) হয়েও সেবার 'বাংলা বিষয়' নিয়ে ভর্তি হয়নি একটিও ছাত্রছাত্রী। শুধু সেবার নয়, গতবছরও (২০০২ সালে) বাংলা বিষয়ে ভর্তি হয়নি কেউ। কারণ ? ছাত্রছাত্রীর বক্তব্য---'বাংলায় নম্বর ওঠে না'। ওদিকে বাংলা বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের বক্তব্য---'নম্বর উঠবে কিভাবে ? এরা (ছাত্র-ছাত্রীরা) তো বাংলা বাক্যগঠন করতেই শেখেনি। বাংলা শিক্ষায় এদের 'বেস'টাই যে রয়ে গেছে কাঁচা।' ফলত এ সিদ্ধান্তে আসাই যায় যে 'বেস' তৈরি হবে কি করে---তার উপকরনেই তো রয়ে গেছে 'ভেজাল'!

'বাংলা'র দুরবস্থার জন্য উপরোক্ত কারণই একমাত্র মুখ্য নয়। আন্দামানের সেট্‌লাররা বেঁচে থাকার তাগিদেই গ্রহণ করেছেন হিন্দিকে। তবে, গ্রহণ করলেই যে মাতৃভাষাকে বর্জন করতে হবে, তার কোনও অর্থ না থাকলেও, সেট্‌লার-বংশধরগণ তাই করে চলেছেন দিনের পর দিন। হয়তো তাঁদের মানসিকতা এখানে স্পষ্ট। 'ভাষা' তো তাঁদেরকে দেয়নি কিছুই; দেয়নি আপন মাটিতে থাকার অধিকার। ভাষা এক হয়েও তো তাঁদের চোদ্দ পুষের ভিটেয় থাকতেপারেন নি তাঁরা। আজন্মলালিত একটি বিশ্বাসের দায় অর্থাৎ ধর্মচতনা সেদিন ঠাঁই পেয়েছিল ভাষাচেতনার উপর। আর সেই ধর্মচেতনার কাছে 'বসতি' জলাঞ্জলি দিয়ে, ওপড়ানো শিকড় নিয়ে আন্দামানে এসে, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য এই বাঙালিকে লড়াই করতে হয়েছে ঘন জঙ্গল, সাপ, বিছে, জোঁক, মশা, ডাঁশ--এইসব মনুষ্যেতর প্রাণীদের সঙ্গে। সেই সংগ্রামের দিনগুলিতে তাঁরা ভাবতেও পারেন নি ভাষা সংরক্ষণের কথা--তাঁদের তখন 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। এইভাবে সেট্‌লারদের প্রথম প্রজন্ম যখন আন্দামানের মাটিতে থিতু হয়েছে--- দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে তখনপ্রাধান্য পেয়েছে, না---ভাষাচর্চা নয়, অর্থোপার্জন, সচ্ছলতা। প্রথম প্রজন্ম'র হাত থেকে সংসারের রাশ হাতে নিয়ে---তাদের বিশ্রাম দেওয়া, সুখি করা। আর, সেট্‌লারদের তৃতীয় প্রজন্ম যখন শিক্ষার আলো দেখার চোখ তৈরি করেছে---ততদিনে আন্দামানে ছেয়ে গেছে হিন্দি--

সংস্কৃতির কুয়াশা যাতে আজও আচ্ছন্ন তাদের চোখ। এই কুয়াশা সরিয়ে,মাতৃভাষার সোনালী ময়ুখস্নান করা মন্ত্রদাতা ‘গু’ তাদের মধ্যে না থাকার ফলে আজ এই তৃতীয় সহস্রাব্দের ঊষালগ্নে আন্দামানের ‘নীলকণ্ঠ’ বাঙালি সম্প্রদায় ভাষাগত বিচারে এক ‘বর্ণসঙ্কর’ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই পরিণতির জন্য আন্দামানের বাঙালিরা সিকি অংশে দায়ী হলে---বারো আনা দায় বর্তাবে আমাদের ঘাড়ে; আমরা, যারা ভাষাচর্চার আন্দোলন করি, ভাষা সংরক্ষণ ভিত্তিক সংগ্রাম করার বড় বড় বুলি আওড়াই, আর এই ‘কোরক’--এরমতো অজস্র পত্রপত্রিকার নিউজপ্রিন্ট / ম্যাপলিথো ভরাই কালো ওক্ষর সমূহের কঙ্কাল করোটি দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে তারা কখনও ভেবে দেখেছে আন্দামানের বাঙালিদের কথা ?অথচ, তামিলনাড়ুর জনগণ কিন্তু আন্দামানের তামিলদের কথা ভাবে. তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক নেতারা হামেশাই আন্দামানের বুকে মিটিং মিছিল করেন, এখানকার তামিলদের দুঃখ দুর্দশার খোঁজ নেন। তামিল চলচিচত্রের নায়ক-নায়িকারা আন্দামানে আসেন, তামিল যুবকযুবতীদের সঙ্গে মেশেন। জনগণের কথা না হয় থাক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতটুকু খোঁজ রাখেন আন্দামানের বাঙালি সম্পর্কে ? এ সরকার কি জানে-- আন্দামানের বাঙালি ছাত্র বাংলায় স্কুল - পাঠ্যবই পড়লে, কি বই তারা পড়ে ? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি কোনো মাথ্যব্যথা আছে আন্দামানের বাঙালিকে বাংলা ভাষা শিক্ষায় শিক্ষিত করার ! পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, তামিলনাড়ু সরকারের কিন্তু রীতিমতো ‘স্কীম’ আছে আন্দামানের ‘তামিল’দের উচচশিক্ষায় শিক্ষিত করার। শুধু তামিলনাড়ু নয়, এ ধরনের সদিচ্ছামূলক স্কীম আছে মালয়ালামভাষীদের জন্য কেরল সরকারের, তেলুগু ভাষীদের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের। এমনকি, এই সেদিন জন্ম নেয়া ঝাড়খণ্ড সরকারও আন্দামানের রাঁচি সম্প্রদায়ের জন্য চালু করেছেন উচচশিক্ষার স্কীম। অথচ, হায় আন্দামানের বাঙালি ! তোমাদের কথা ভাবতে--- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সে সময় কই ! পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালিদেরও বা সে সময়বা সদিচ্ছা কই ! তারা তো শুধু জানে ‘চলবে না, চলবে না’ জিগির তুলে খিদিরপুর ডক থেকে আন্দামানে আসার জাহাজকে যখন তখন বন্ধ করে দিতে। তারা পারে যে কোনও ছুতোয় কোলকাতা-পোর্টব্লেয়ার মার্গের বিমান চলাচল রদ করে দিতে ; তাদের যোগ্যতা আছে শুধু কোলকাতা থেকে প্লেনে ডাক / সংবাদপত্র ওঠানো বন্ধ করানোর। আর তাদের এই মহানুভবতার দৌলতে আন্দামানের বাঙালিরা অনেকক্ষেত্রে বাধ্য হচ্ছে চেন্নাই-নির্ভর হতে ; প্রকারান্তরে তামিলভাষীদের শরণাপন্ন হতে।

লেখকের কৈফিয়ৎ প্রবন্ধটি বাংলা ভাষাভিত্তিক হওয়ার কথা ছিলো। সম্পাদক (কোরক) অনুরোধ করেছিলেন---আন্দামানের বাংলা ভাষারীতি, বাংলা ভাষা বৈশিষ্ট্য, উচচারণরীতি ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে। কিন্তু লিখতে বসে মনে হয়---‘আন্দামানের বাংলা ভাষাচর্চা’ নিয়ে আর কতটা বা কী লেখা যায় ! যেখানকার বাঙালি ক্লাব-ই ১৯৮৫/৮৬-রপর থেকে ছেড়ে দিয়েছে বাংলা ভাষা / সংস্কৃতিচর্চা, সেখানে আমার মতো এক নগণ্য মানুষ বাংলা ভাষাচর্চার উপরকি আলোকপাত করতে পারে ? যেখানে বাংলা’র অধ্যাপক (M. Phil, Ph. D) ‘কাব্যশ্রী’ / ‘ভাষাশ্রী’ ইত্যাদি গালভরা উপাধি নিয়ে বসে থাকেন হাত - পা গুটিয়ে, যেখানকার ইতিহাস/ ভূগোলবিষয়ক শিক্ষক, সারস্বত-সাধনার শীর্ষসংস্থার সদস্য হয়ে নির্লজ্জভাবে শ্রাদ্ধ করতে পারেন বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের, যেখানকার ‘গেজেটেড ক্লাস -ওয়ান অফিসার’ নিজের পয়সায় বার করে ফেলেন একের পর এক কাব্যগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ মায় উপন্যাস---সেখানে আমার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ যোগ্যতার মানুষ বাংলা ভাষাচর্চার কোন্ নতুন দিকের উন্মোচন করতে পারে ? এমন ‘মহাজন’রা যখন তাঁদের নৈতিক এবং ভাষাগত দায় থেকে পালিয়ে বেড়ান আর গালভরা ‘সার্মোন’ দেন এখানে-সেখানেঅথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে ভয় পান--- ‘‘তার মাঝে তুই ‘অবোধ শিশু’ কোন অভিযান করবি শুনি ?’’

তাই লেখা হল সেই মানুষগুলির চরিতকথা--যারা মার খেতে খেতে একদিন এসে জীবনতরী ভিড়িয়েছিলো এই সাগর কিনারায়। ফিনিক্স পাখির মতো যারা ছাই হতে হতে আবার জন্ম নিয়েছিলো। এই আন্দামানের মাটিতে। তাদেরই একজন হয়ে, তাদের কথাই লিপিবদ্ধ করলাম এখানে--এই আশায়, যদি একদিন তাদের মরা গাঙে বান আসে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com